১০টি মিথ্যা

ভারতের
কমিউনিস্ট
পার্টি (মার্কসবাদী)

সিএএ, এনআরসি এবং এনপিআর: মোদী সরকারের দশটি বড় মিথ্যা

মোদী সরকার ভারতের হৃৎপিণ্ডে যে ত্রিশুল আক্রমণে উদ্যত তার তিনটি ফলা হলো : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট বা সিএএ), জাতীয় নাগরিক নিবন্ধক (ন্যাশনাল রেজিস্টডার অব সিটিজেসি বা এনআরসি) এবং জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধক (ন্যাশনাল পপুলেশন রেজিস্টার বা এনপিআর)। মোদী মন্ত্রিসভা জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধক (এনপিআর) আপডেট করার জন্য অবিলম্বে প্রস্তুতি শুরু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পার্লামেন্টের উভয় সভায় সিপিআই(এম)-এর তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও সিএএ পাশ হওয়ার পরে, এটি দ্বিতীয় বিপজ্জনক পদক্ষেপ কারণ এটি এমন একটি কাঠামো গড়ে তুলতে চায় যা আগ্রাসীভাবে নাগরিকত্বের অধিকারের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের লক্ষ্যে পরিচালিত হবে।

একই সাথে, আসাম চুক্তির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের কারণে, সিপিআই(এম) মনে করে যে পুরো উত্তর-পূর্ব ভারতকে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া থেকে দূরে রাখা উচিত। আমাদের পার্টি নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (সিএবি)-তে এ বিষয়ে সংশোধনী দিয়েছিল যা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো যে আসাম চুক্তিতে ১৯৭১ সালের ২৪শে মার্চের পর যারা ভারতে এসেছে তাদের ক্ষেত্রে ঐ তারিখটিকে নাগরিকত্বের 'কাট-অফ ডেট' হিসাবে ধার্য করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই বিচারের ক্ষেত্রে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও পার্থক্য করা হয়নি। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) আসাম চুক্তির উপর সরাসরি হামলা করেছে তো বটেই, সেইসাথে ''বিদেশি'' প্রশ্নে একটি সাম্প্রদায়িক মাত্রা যোগ করেছে।

এখন যখন দেশজুড়ে বিশাল বিক্ষোভ চলছে, মোদী-শাহ জুটি তাদের মিথ্যা উৎপাদন কারখানাটি পুরোদমে কাজে নামিয়েছে। হিটলারের জার্মানিতে নাৎসি প্রচার নীতিটির কথা এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য : ''একটি মিথ্যা বারবার বললে সেটি ধারণাগতভাবে সত্য হয়ে যায়''। মোদী সরকারের নীতিও ঠিক তাই। এই প্রতিটি মিথ্যার স্বরূপ প্রকাশ করতে হবে। মিথ্যাগুলির তালিকা ক্রমবর্ধমান : আসুন তার থেকে দশটি বড় মিথ্যাচার বেছে নিয়ে তাদের দিকে নজর দিই :

মিথ্যা নং ১ : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) বৈষম্যমূলক নয়। নিপীড়িতদের সহায়তা করা ভারতের সংস্কৃতি। কোনও ভারতীয় নাগরিক এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

সত্য : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) ভারতের সংবিধানের উপর আঘাত। ১৯৫৫ সালে ভারতীয় নাগরিকত্ব আইন গৃহীত হয়েছিল। আইনে ভারতীয় নাগরিক হওয়ার পাঁচটি উপায় তাতে সংজ্ঞায়িত হয়, জন্ম, বংশোদ্ভব, প্রাকৃতিকীকরণ, নিবন্ধকরণ ও আঞ্চলিক অন্তর্ভুক্তি। এর কোনোটিতেই ধর্মের উল্লেখ নেই। ঐ আইন ছিল এ দেশে নাগরিকত্বের

সাংবিধানিক সংজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ যা ভারতে নাগরকিত্ব অর্জনে ধর্মীয় বিশ্বাস বা বর্ণ, শ্রেণি বা লিঙ্গ ভিত্তিতে কোনও ব্যক্তির সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করেনি।

আজকের নাগরিকত্ব সংশোধীন আইন (সিএএ) অবৈধ অভিবাসীদের উপর (১) (খ) ধারা সংশোধন করে গোটা বিষয়টির অভিমুখ গরিবর্তন করে দিয়েছে। ''অবৈধ অভিবাসী'' (illegal migrant) শব্দবন্ধটি ২০০৩ সালে বাজপেয়ী সরকারের সময়ে চালু হয়েছিল। তখনই এর উদ্দেশ্য পরিষ্কার হলেও সেই সময় এটি ধর্মীয় পরিচয় অনুসারে অবৈধ অভিবাসীদের সংজ্ঞায়িত করেনি। মোদী সরকার এখন সেই অসম্পূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে। সিএএ-তে (১) (খ) ধারা সংশোধন করে বলে দিয়েছে ''আফগানিস্তান, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সী বা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের যে কোনও ব্যক্তি যিনি ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে বা তার আগে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন তাকে অবৈধ অভিবাসী হিসাবে বিবেচনা করা হবে না।''

এই সংশোধনীর মাধ্যমে, স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে এই প্রথম ভারতের নাগরিক হওয়ার জন্য ধর্ম একটি ভিত্তিতে পরিণত হয়েছে। ধরা যাক দু'জন ব্যক্তি রয়েছেন যারা একই নথি নিয়ে ভারতে বসবাস করছেন; তাদের বসবাসের প্রমাণ আছে কিন্তু তাদের পূর্বপুরুষদের বিষয়ে কেনও প্রমাণ নেই। যদি ব্যক্তিটি অ-মুসলিম হয় তবে সে ''আইনী' হবে এবং যদি সে মুসলিম হয় তবে তাকে অবৈধ হিসাবে বিবেচনা করা হবে। এটি ১৪ নং অনুচ্ছেদের ওপর আক্রমণ, যে ধারা অনুসারে সব ব্যক্তি আইনের চোখে সমান এবং আইনের দ্বারা সমানভাবে সংরক্ষিত এবং যে ধারা সংবিধানের মূল কাঠামোর একটি অংশ।

এটি অন্য একটি দিক থেকেও অত্যন্ত বৈষম্যমূলক। কেন কেবল এই তিনটি দেশকে বেছে নেওয়া হলো? শ্রীলঙ্কা বা মায়ানমার থেকে আসা শরণার্থীরা কেন বিবেচিত হবেন না? পাকিস্তানের আহমদিয়া সম্প্রদায় কেন বাদ? তারা নিজেদের ''নিপীড়িত'' হিসাবে বিবেচনা করে, তবু তারা বাদ। সুতরাং আইনটি নির্দিষ্টভাবেই বাছাইভিত্তিক এবং সেই কারণেই বৈষম্যমূলক।

এই আইনের দ্বিতীয় সংশোধনী ভারতীয় নাগরিকত্বের জন্যে আবেদনের যোগ্য হতে গেলে ভারতে কত বছর বসবাসের প্রয়োজন, সেই বিষয়ে। এটিকে ১৯৫৫ সালের মূল আইনের ৬.১ ধারায় প্রাকৃতিকীকরণের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত নাগরিকত্ব বলা হয়েছে। প্রাকৃতিকীকরণের জন্য যোগ্যতার আরও বিশদ বিবরণ এই ১৯৫৫-র আইনের তৃতীয় তফসিলে রয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে পূর্ববর্তী এগারো বছর ধরে ভারতের বাসিন্দা যে কোনও ব্যক্তি প্রাকৃতিকীকরণের মাধ্যমে নাগরিকত্বের যোগ্য। ধর্মের কোনও উল্লেখ আজকের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ ২০১৯) পূর্বে উল্লিখিত তিনটি দেশের বাকি সকলের জন্য বসবাসের প্রয়োজনীয় সময় কমিয়ে পাঁচ বছর করেছে, শুধু মূসলমান ছাড়া। এই ধর্মভিত্তিক সংশোধনী সুস্পষ্টভাবে বৈষম্যমূলক।

সিএএ-র সংশোধনের আগেই, ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে মোদী সরকার সম্পূর্ণ গোপনভাবে এবং সংসদের নজরের আড়ালে ১৯২০ সালের পাসপোর্ট (ভারতে প্রবেশ)

আইন, বিদেশি আইন ১৯৪৬ পরিবর্তন করে। এই সংশোধনীগুলির মাধ্যমে ধর্মীয় ভিত্তিতে স্থিরীকৃত এই একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ (হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পার্সি এবং খ্রিস্টান) যারা ৩১শে ডিসেম্বর, ২০১৪ বা তার আগে ভারতে এসেছেন তাদের ভারতে থাকার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। আজকে সিএএ-তে যে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে, হুবহু সেই শব্দপ্রয়োগ ঘটেছিল ২০১৫ সালের দুটি আইনে। এই পরিবর্তনগুলি প্রমাণ করে সরকার কিভাবে নাগরিকত্ব এবং সংশ্লিষ্ট অধিকার অর্জনের প্রশ্নে একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমানদেরকে বাদ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ভারতের সংবিধানকে বিকৃত করার পরিকল্পিত পদক্ষেপ নিয়ে চলেছে।

মিথ্যা নং ২ : যে বিরোধী দলগুলি এক সময় হিন্দু অভিবাসী সম্প্রদায়কে সমর্থন করেছিল তারাই এখন ভোট ব্যাঙ্কের রাজনীতির কারণে সংশোধনীর বিরোধিতা করছে।

প্রধানমন্ত্রী ২২ ডিসেম্বর তাঁর ভাষণে বলেছেন যে কংগ্রেস এবং সিপিআই(এম) ''বাংলাদেশ থেকে আগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের'' জন্য আইন চেয়েছিল কিন্তু এখন ইউ-টার্ন করেছে। তারা ২০১২ সালে ২০তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত একটি প্রস্তাব এবং তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ কারাতের একটি চিঠি উদ্ধৃত করছে।

সত্য : মোদী সরকারের একাংশের মানুষকে নাগরিকত্বের অধিকার থেকে বাদ দেওয়ার বিষাক্ত নীতির সঙ্গে বঞ্চিত শ্রেণির অধিকারের জন্য উদ্বেগ প্রকাশকে এক করে দেখা ভুল।

সিপিআই(এম) নিঃসন্দেহে ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীদের দুর্দশা নিয়ে উদ্বিগ্ন। ব্রিটিশ-পরিচালিত দেশ ভাগের অসহায় শিকার হয়ে যে এক কোটির বেশি ভিটেচ্যুত মানুষ নতুন সীমান্ত পেরোতে বাধ্য হয়েছিলেন তাদের মানবিক অধিকার অর্জনের প্রশ্নে কমিউনিস্ট এবং বামপন্থীরাই উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। পশ্চিমবঙ্গেঝ কমিউনিস্ট ও বাম আন্দোলনের একটি স্থায়ী বৈশিষ্ট্য হলো এই ভিটেমাটিহীন অসহায় মানুষের যথাযথ পুনর্বাসন নিশ্চিত করার লড়াই। বাংলার উদ্বাস্তু মানুষের সেই কঠিনতম দুঃসময়ে আরএসএস কার্যত কোনও ভূমিকাই পালন করেনি।

আমাদের পার্টি বাংলাদেশ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের মধ্যে নমঃশুদ্র দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যে তফসিলি জাতি হিসাবে স্বীকৃতি দাবি করেছে, যে কাজ পশ্চিমবঙ্গে করা হলেও অন্যান্য রাজ্যের যেমন ইউপি, উত্তরাখণ্ড এবং মধ্যপ্রদেশে যেখানে এই অংশের মানুষ বসতি স্থাপন করেছিলেন সেখানে করা হয়নি। ওই রাজ্যগুলিতে যে বিজেপি পরিচালিত সরকার ছিল তারা এই মর্যাদা দিতে অস্বীকার করেছিল। পার্টি কংগ্রেসে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং পরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে একটি চিঠি লেখা হয়।

তবে কখনও কোনোদিন সিপিআই(এম) যারা বাংলাদেশ থেকে আগত তাদের নাগরিকত্বের অধিকার সম্পর্কিত বৈষম্যমূলক আইন তো বটেই, সাধারণভাবে কোনও ধরনের নীতিগত সিদ্ধান্ত থেকে মুসলমানদের বাদ দেওয়ার নীতি আদৌ সমর্থন করেনি। সিপিআই(এম) ধর্মের ভিত্তিতে নাগরিকত্বের জন্য যোগ্যতার সংজ্ঞায়ন বা এ জাতীয় কোনও পৃথকীকরণের সম্পূর্ণ বিরোধী।

মিথ্যা নং ৩ : নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন অর্থাৎ সিএএ-র জাতীয় নাগরিক নিবন্ধক (এনআরসি'র সাথে কোনও সম্পর্ক নেই। এটি সম্পূর্ণ পৃথক এবং বিরোধীরা মিথ্যাভাবে দুটিকে যুক্ত করার চেষ্টা করছে।

সত্য : সিএএ এবং এনআরসি একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বিজেপি'র পরিকল্পনা প্রথমে সিএএ বাস্তবায়ন, যা আফগানিস্তান, বাংলাদেশ বা পাকিস্তান এই তিনটি দেশ থেকে আসা সমস্ত অমুসলিমকে নাগরিকত্বের অধিকার দেবে। তার পরে এনআরসি দিয়ে ''অনুপ্রবেশকারী'' সনাক্ত করবে। অনুপ্রবেশকারী এবং শরণার্থীদের মধ্যে পার্থক্য কী? কেবলমাত্র মুসলমানরা সিএএ-তে শরণার্থী হিসাবে যোগ্যতা অর্জন করে না এবং তাই তারা অনুপ্রবেশকারী। নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে দেখা যায় যে দুটোর মধ্যে মারাত্মক সংযোগ বিজেপি নিজেই স্পষ্ট করে দিয়েছে :

এপ্রিল ২০১৯-এ অমিত শাহ বলেছিলেন, ''প্রথমে সিএবি আসবে। সমস্ত শরণার্থী নাগরিকত্ব পাবেন। তারপরেই এনআরসি আসবে। এ জন্যে শরণার্থীদের দুশ্চিন্তা করা উচিত নয়, অর্থাৎ দুশ্চিন্তার বিষয় কেবল অনুপ্রবেশকারীদের। কালানুক্রম বুঝুন – সিএবি আসবে এবং তারপরে এনআরসি। এনআরসি কেবল বাংলার জন্য নয়, এটি পুরো দেশের জন্য'' (বিজেপি'র অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিডিও)।

৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ : অমিত শাহ সংসদে বলেছিলেন যে সিএএ পাসের পর একটি দেশব্যাপী এনআরসি হবে। লোকসভায় সিএএ নিয়ে বিতর্ক চলাকালীন তিনি বলেছিলেন, ''আমরা দেশজুড়ে এনআরসি নিয়ে আসব। একজনও অনুপ্রবেশকারীকে রেহাই দেওয়া হবে না।''

১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯ : বিজেপি'র কার্যনির্বাহী রাষ্ট্রপতি জে পি নাড্ডা জানিয়েছিলেন যে সিএএ বাস্তবায়িত হবে এবং ''এগিয়ে গিয়ে এনআরসিও আনা হবে।'' তিনি আরও বলেছিলেন, ''প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে দেশ এগিয়ে চলেছে এবং চলবে। নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন কার্যকর করা হবে, ভবিষ্যতে এনআরসিও হবে।''

না, বিরোধী দলগুলো সিএএ এবং এনআরসি'কে সংযুক্ত করেনি, বিজেপি'র কলঙ্কিত পরিকল্পনাই এই দুটির যোগসূত্র।

মিথ্যা নং ৪: মোদী ২২ ডিসেম্বর দিল্লির সমাবেশে বলেছিলেন : আমি ভারতের ১৩০ কোটি নাগরিককে জানাতে চাই যে ২০১৪ সাল থেকে যেদিন আমার সরকার ক্ষমতায় এসেছে, এনআরসি নিয়ে কোথাও কোনও আলোচনা হয়নি।''

সত্য : ভারতের ট্র্যাজেডি হলো দেশের প্রধানমন্ত্রী নিজেই মিথ্যা উৎপাদন কারখানার প্রধান।

২০ জুন, ২০১৯: সংসদের একটি যৌথ অধিবেশনে রীতিসম্মত বক্তব্যে ভারতের রাষ্ট্রপতি বলেছিলেন – ''অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা আমাদের অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার জন্য একটি বড় বিপদস্বরূপ। এটি সামাজিক ভারসাম্যহীনতার দিকে ঠেলে দিচ্ছে এবং জীবিকার সীমাবদ্ধতার সুযোগগুলিতে একটি বিশাল চাপ সৃষ্টি করছে। আমার সরকার

অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে জাতীয় নাগরিক নিবন্ধনের প্রক্রিয়া (এনআরসি) বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে... একদিকে সরকার অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্ত করতে কাজ করছে, অন্যদিকে ধর্মবিশ্বাসের কারণে নিপীড়নের শিকারদের রক্ষা করার জন্যও পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'' রাষ্ট্রপতির ভাষণটি সরকারের প্রস্তুত করা একটি নীতি বিবৃতি। তাহলে প্রধানমন্ত্রী কীভাবে বলতে পারেন যে কোনও আলোচনা হয়নি?

২১ নভেম্বর, ২০১৯ : রাজ্যসভায় অমিত শাহ বলেছিলেন, ''জাতীয় নাগরিক নিবন্ধকের প্রক্রিয়া (এনআরসি) সারা দেশে পরিচালিত হবে।'' এই বিবৃতি কি আলোচনা ব্যতিরেকে করা হয়েছিল?

সংসদে তাদের জবাবে সরকারের মন্ত্রীরা এনআরসি বাস্তবায়নের নয়টি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেছেন। এগুলো জনসাধারণের সামনে বক্তৃতায় অগণিত অনুরূপ উচ্চারণগুলি বাদ দিয়ে হিসাব। এই সমস্ত সরকারি বিবৃতি আলোচনা ছাড়া হয়েছে? প্রধানমন্ত্রী মোদী কি তাদের ওইসব বক্তব্য প্রত্যাহার করছেন? এর অর্থ কিন্তু এই দাঁড়ায় যে ওই মন্ত্রীরা সংসদকে বিভ্রান্ত করার অপরাধে দোষী ছিলেন।

মোদী ১৩০ কোটি ভারতীয়কে মিথ্যা বলেছেন, যখন তিনি বলছিলেন যে, এনআরসি নিয়ে কখনও আলোচনা হয়নি।

মিথ্যা নং ৫: মোদী এবং তাঁর মন্ত্রিসভায় সহকর্মীরা, তাদের দলের মুখপাত্ররা এবং তাদের মিডিয়ার সাঙাৎরা বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে মিথ্যা ছড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ করেছে এবং দাবি করেছে যে এনআরসি প্রক্রিয়া কোথাও বৈধ হয়নি। স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জি কিষান রেড্ডি বলেছেন : ''দেশব্যাপী এনআরসি নিয়ে এখনও অবধি কোনও প্রজ্ঞাপন করা হয়নি এবং কারও ভয় পাওয়া উচিত নয়।''

সত্য : এনআরসি'র জন্য আইন ২০০৩ সালে বাজপেয়ী সরকারের সময়ে এল কে আদবানির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকা অবস্থায় গৃহীত হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে ভারতীয় নাগরিকদের জাতীয় নিবন্ধকরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এটি নাগরিকত্ব আইন ১৯৫৫-র সংশোধনীর মাধ্যমে করা হয়েছিল। এই আইনের সংশোধনীগুলির মধ্যে একটি হলো দফা ১৪ক'র সংযোজন যেখানে বলা হয়েছিল : দফা ১৪ক (২) অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয় নাগরিকদের একটি জাতীয় রেজিস্টার (National Register of Indian Citizens) রক্ষা করতে পারবে এবং সে লক্ষ্যে একটি জাতীয় নিবন্ধকরণ কর্তৃপক্ষ (National Registration Authority) প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। (৩) ...ভারতের রেজিস্টার জেনারেল জাতীয় নিবন্ধকরণ কর্তৃপক্ষ হিসাবে কাজ করবেন এবং তিনি নাগরিক নিবন্ধকরণের রেজিস্টার জেনারেল হিসাবে কাজ করবেন।''

সেই প্রথম নাগরিকদের একটি জাতীয় নিবন্ধকের ধারণা চালু করা হয়েছিল এবং আইনে সবাইকে জাতীয় পরিচয়পত্র দেওয়ার কথাও আসে। সুতরাং এনআরসি ইতিমধ্যে নাগরিকত্ব আইনের অংশ হওয়ায় আলাদা আইনের দরকার নেই। এনআরসি বাস্তবায়নের জন্য ২০০৩ সালে বিধিও প্রণীত এবং গৃহীত হয়েছিল। এই বিধিগুলিতে এনআরসি যে প্রক্রিয়াটির

মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হবে সে সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে।

মিথ্যা নং ৬: এনআরসি প্রক্রিয়া এখনও শুরু হয়নি এবং এ নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি নেই।

সত্য : এনআরসি বাস্তবায়নের বিধিগুলি যা ২০০৩ সালে বাজপেয়ী সরকার গৃহীত হয়েছিল তা স্পষ্টভাবে জানিয়েছে যে জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধক (এনপিআর)-র জন্য ঘরে ঘরে গণনার মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি শুরু হবে ...ধারাটিতে এনআরসি'র জন্য বিধি ৪ বলেছে, ''স্থানীয় রেজিস্টারের আওতাধীন যারা থাকেন তাদের সকলের বিষয়ে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে একটি জনসংখ্যা রেজিস্টার প্রস্তুত করা হবে। ভারতীয় নাগরিকদের স্থানীয় রেজিস্টারে (জাতীয় রেজিস্টারের অংশ হিসাবে) জনসংখ্যা রেজিস্টারের থেকে যথাযথ যাচাইয়ের পরে ব্যক্তিদের বিশদ বিবরণ থাকতে হবে।'' সুতরাং এটি যথেষ্ট স্পষ্ট যে জনসংখ্যা রেজিস্টার যাচাইয়ের পরে এনআরসি চূড়ান্ত করা হবে।

২০১৪ সালেই এনআরসি এবং এনপিআর'র মধ্যে যোগসূত্রটি তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরন রিজজু স্পষ্ট করেছিলেন। তিনি ওই বছরের ২৩ জুলাই সংসদে জানিয়েছিলেন ''সরকার এখন সিদ্ধান্ত নিয়েছে এনপিআর প্রকল্পের আওতায় দেশের সকল ব্যক্তির নাগরিকত্বের অবস্থা যাচাই করে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে ভারতীয় নাগরিকদের জাতীয় নিবন্ধীকরণ রেজিস্টার সৃষ্টি করবে।''

এনপিআর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। এনপিআর প্রস্তুত ও আপডেট করার জন্য বিজ্ঞপ্তিটি ৩১ জুলাই, ২০১৯-এ রেজিস্টার জেনারেল অফ সিটিজেন রেজিস্ট্রেশন একটি গেজেট প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে জারি করেছিলেন যেখাবে বলা হয়েছিল যে ঘরে ঘরে গণনা শুরু হবে ১ এপ্রিল থেকে চলবে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। সুতরাং এনআরসি প্রক্রিয়া শুরু হয়নি তা বলা মিথ্যা। এনপিআর-র মাধ্যমে এনআরসি-র জন্য প্রথম পর্যায়ের প্রজ্ঞাপন ইতিমধ্যে করা হয়েছে।

মিথ্যা নং ৭: অমিত শাহ বলেছেন এনআরসি-র সাথে এনপিআর-এর কোনও যোগসূত্র নেই। এটি অতিরিক্ত প্রশ্নসহ এনপিআর আপডেট করার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে। কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী প্রকাশ জাভডেকর দাবি করেছেন যে, জাতীয় জনসংখ্যা রেজিস্টার কেবলমাত্র জনগণনার উদ্দেশ্যে এবং এনআরসি বা নাগরিকত্বের সাথে তার কোনও যোগসূত্র নেই। তাই বিরোধীরা কেন দাবি করছে যে এটি ভারতীয়দের নাগরিকত্বকে প্রভাবিত করবে?

সত্য : অমিত শাহের মন্ত্রণালয় এই কথা ২০১৮-২০১৯'র বার্ষিক প্রতিবেদনে বলেছিল। পঞ্চদশ অধ্যায়ের ১৫.৪০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে, 'ভারত সরকার সকল সাধারণ বাসিন্দার নির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ করে দেশে জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধকরণ (এনপিআর) তৈরির একটি প্রকল্পকে অনুমোদন দিয়েছে। এনপিআর হলো ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ ইন্ডিয়ান সিটিজেন (এনআরআইসি) তৈরির দিকে প্রথম পদক্ষেপ। ২০১০ সালে সংগৃহীত এনপিআর-এর জন্য জনসংখ্যার প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ২০১৫ সালে আপডেট করা হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ৩৩.৪৩ কোটি মানুষের বায়োমেট্রিক তালিকাভুক্তিও করা হয়েছে...।''

তাহলে মিথ্যাবাদী কে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক নাকি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী?

প্রথমে সরকার সিএএ এবং এনআরসি'র মধ্যে সংযোগ অস্বীকার করেছিল। যখন এই মিথ্যাটি উন্মোচিত হয়ে গেছে সরকার এনপিআর সম্পর্কিত সত্য গোপন করেছে। যেহেতু ২০২১ সালের জন্য আদমসুমারির সাথে এনপিআর আপডেট করা হচ্ছে, সরকার দাবি করছে যে এটি জনগণনার একটি অংশ। একথা ঠিক যে জনগণনা কর্তৃপক্ষ উভয় প্রক্রিয়া হাতে নিয়েছে তবে দুটি আলাদা জিনিস যাদের আলাদা আলাদা ফরমাট এবং প্রশ্নপত্র রয়েছে।

এনপিআর সরাসরি এনআরসি-র সাথে যুক্ত। ২০২০ সালের ১ এপ্রিল থেকে, জাতীয় জনসংখ্যা নিবন্ধকের (National Population Register)-র জন্য ঘরে ঘরে গণনার মাধ্যমে নাগরিকদের জাতীয় নিবন্ধক (National Register of Citizens)-র প্রক্রিয়া শুরু হবে। মোদী সরকার ছয়টি নতুন প্রশ্ন যুক্ত করেছে যার ফলে নাগরিকদের জন্যে প্রথম পর্যায়ে মোট প্রশ্নের সংখ্যা একুশে এসে পৌঁছেছে। এর মধ্যে ১৫টি মূল প্রশ্ন জনসংখ্যার তথ্যাবলী সম্পর্কিত, যেমন নাম, বয়স, লিঙ্গ, পরিবারে সম্পর্ক, জাতীয়তা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, জন্ম তারিখ, দাম্পত্য অবস্থা, আবাসিক ঠিকানা, জন্মস্থান এবং মাতৃভাষা। নতুন ৬টি প্রশ্নের মধ্যে পিতা এবং মাতার নাম, তাদের জন্মস্থান এবং জন্মের তারিখ এবং আধার বিবরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তারপরে সেই ব্যক্তির বায়োমেট্রিক্স যাচাইয়ের জন্য আধার তথ্যটি ভারতের আধার কর্তৃপক্ষ (ইউআইএডিআই)-র সাথে ক্রশচেক করা হবে।

এনপিআর জনগণনার একটি অংশ একথা বলা নির্জলা মিথ্যা। এটা আদৌ তা নয়।

মিথ্যা নং ৮: কোনও ভারতীয়ের ভয়ের কিছু নেই।

সত্য : গরিব ও প্রান্তিক মানুষজনের ভয় পাওয়ার কারণ যথেষ্ট। ছয়টি নতুন প্রশ্নের মধ্যে কেন পিতামাতার জন্মতারিখ এবং জন্মস্থান সম্পর্কিত প্রশ্ন যুক্ত করা হয়েছে? ক'টা পরিবারে এই জাতীয় বিবরণ এবং প্রমাণ রয়েছে? আসামে এনআরসি-র ক্ষেত্রে, যা অবশ্যই আলাদা প্রকৃতির ছিল, আমরা দেখেছি এ নিয়ে কী প্রচণ্ড গোলযোগ ঘটে এবং প্রয়োজনীয় নথি না থাকা দরিদ্র মানুষজন কী ভয়াবহ ভয় পেয়েছিলেন। এর মধ্যে সব ধর্ম, বর্ণ, ভাষার নাগরিক অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পরিবারের সদস্যদের বিদেশি ঘোষণা করা হয়েছিল। কারগিল যুদ্ধে ভারতের যে সীমান্ত রক্ষার জন্য লড়াই করেছিল সেই সৈনিককে বিদেশি ঘোষণা করা হয়েছিল। বিপুলসংখ্যক মহিলা যারা বিয়ের কারণে অন্যত্র চলে এসেছেন তারা তাদের প্রাকৃতিক পারিবারিক নথি তৈরি করতে পারেননি এবং তাই তাদের ভারতীয় নাগরিক হিসাবে অস্বীকার করা হয়েছিল।

গণনার পরে, প্রাপ্ত তথ্য প্রথমে আধার কর্তৃপক্ষের (ইউআইডিএআই) সাথে ক্রশচেক করা হয় যাতে ব্যক্তিটির বায়োমেট্রিকগুলি নিশ্চিতভাবেই যাচাই হয়। দেখা গেছে যে আধার উৎপাদিত বায়োমেট্রিকের অমিলের সমস্যা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষকে তাদের সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত করেছে। নাগরিকত্ব যাচাইয়ের ক্ষেত্রে যদি এরকম ঘটে তাহলে সেটা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র মানুষের জন্য দুঃস্বপ্নের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

আধার যাচাইয়ের পরে, প্রাপ্ত তথ্য স্থানীয় জনসংখ্যা রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়। স্থানীয় রেজিস্টার তালিকাটি পরীক্ষা করে দেখেন এবং গণনাকারী যে ব্যক্তি বা পরিবারের সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন তাদের নামের পাশে লিখবেন ''ডি'' যার অর্থ doubtful বা সন্দেহজনক। এটি করা হয়ে গেলে, সেই সব ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের অবহিত করা হবে এবং তারপরে তাদের প্রদত্ত তথ্যের সঠিকতা প্রমাণ করার জন্য ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঘুরে জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে যাবে। এই পর্যায়ে নথি দেখাতে হবে। বেশিরভাগ গরিব লোকের কাছে পূর্বপুরুষদের বিষয়ে তথ্যাবলী তো দূরস্থান, নিজের জন্মের শংসাপত্র পাওয়াই দুষ্কর। তার চেয়েও বড় কথা হলো এটা এমন একটা কাঠামো যা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে বিভাজনের পক্ষে খুবই সহায়ক। এর মধ্যে দিয়ে এনআরসি করে নাগরিকদের বেছে বেছে টার্গেট করে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘোষণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে, ''অনুপ্রবেশকারীদের'' হিন্দু 'শরণার্থীদের' থেকে আলাদা করে তাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা ও 'শরণার্থীদের' সিএএ'র মাধ্যমে নাগরিক হওয়ার যোগ্য বিবেচনা করার কাজ সুগম হবে। তারই পাশাপাশি ''সন্দেহজনক নাগরিক'' (D=doubtful) হিসাবে তলব করা ব্যক্তিদের তাদের নাগরিকত্বের প্রমাণ জমা দেওয়ার ভয়াবহ কঠোর প্রক্রিয়াটি পার করতে হবে।

২০০৩ সালে নাগরিকত্ব আইনের সংশোধনী অনুসারে নাগরিক হওয়ার জন্যে ভারতে জন্মগ্রহণ বা ভারতে নির্দিষ্ট সময়কাল ধরে বসবাসের প্রমাণ করাই যথেষ্ট নয়। আমরা আসাম এনআরসি'র সময় দেখেছি যে, দলিলগুলো সাধারণত আমাদের পরিচয় প্রমাণ করে – জন্ম শংসাপত্র, আধার, ভোটার আইডি, প্যান কার্ড বা পাসপোর্ট এগুলোর কোনোটাই নাগরিকত্বের প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃত ছিল না। সমস্যাটিকে আরও ঘোরালো করার জন্য, ২০০৩ সংশোধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে যে সন্তানকে নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হওয়ার জন্য তার পিতামাতার উভয়কেই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে, অথবা পিতামাতার মধ্যে একজনকে অবশ্যই নাগরিক হতে হবেএবং অপরের অবৈধ অভিবাসী হওয়া যাবে না। এর মানে হলো যে, একজন ব্যক্তি যে নিজে নাগরিক তা প্রমাণ করার জন্য, কেবল তিনি এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন এটুকু প্রমাণ করলে হবে না, তার পিতামাতার নাগরিকত্বের পাথুরে প্রমাণ দিতে হবে। যদি তাদের কোনও একজনের কাছে সেই প্রমাণবাহী নথি না থাকে তবে তিনি যে বেআইনি অভিবাসী নন, তা প্রমাণ করার আরও দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে হবে।

মিথ্যা নং ৯: মোদী বলেছেন দেশের কোথাও কোনও ডিটেনশন ক্যাম্প নেই।

সত্য : দেশের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ২০১৯ সালের ১১ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলেছেন যে, নির্বাসনের জন্য অপেক্ষারত অবৈধ অভিবাসীদের বা দোষী সাব্যস্ত বিদেশিদের আটকের জন্য আটককেন্দ্র বা ডিটেনশন সেন্টার স্থাপনের জন্য সমস্ত রাজ্যকে নির্দেশ জারি করা হয়েছে। ৯/১/২০১৯ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রাজ্য সরকার/ কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের প্রশাসকদের কাছে ডিটেনশন সেন্টার নির্মাণের জন্য সুসংহত নির্দেশ পাঠিয়েছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২৪/২৯ এপ্রিল ২০১৪, এবং আবার ৯-১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৪-এ নির্দেশনা প্রেরণ করেছিল। তার ভিত্তিতে, ২০১৮ সালে সমস্ত রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিতে একটি মডেল ডিটেনশন সেন্টার/হোল্ডিং সেন্টার/ক্যাম্প ম্যানুয়াল বিলি করা হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্ণাটক হাইকোর্টকে ২৮ নভেম্বর জানিয়েছে, ''আমরা ২০১৪ সালে সব রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়েছি এবং ২০১৮ সালে পুনরায় চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি যে অবৈধভাবে ভারতে অবস্থানের জন্য আটক বিদেশে নাগরিকদের রাখার জন্য ডিটেনশন সেন্টার করতে হবে।''

কর্ণাটকের মতো অনেক বিজেপি রাজ্য সরকার ইতোমধ্যে ডিটেনশন সেন্টার নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছে। এর আগে মহারাষ্ট্রের ফরনবিশ সরকারও আটক কেন্দ্রের জন্য জায়গা নির্ধারণ করেছিল।

২০১৯ সালের নভেম্বরে, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী রাজ্যসভায় একটি প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন যে আসামের বন্দি শিবিরে যেখানে সন্দেহভাজন অভিবাসীরা আবদ্ধ রয়েছেন সেখানে ২৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর বক্তব্যেই প্রকাশ পায় যে ৯৮৮জন ''বিদেশি'' আসামের অবৈধ অভিবাসীদের জন্য তৈরি মোট ছটি ডিটেনশন সেন্টারে বন্দি।

মিথ্যা নং ১০: বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে কোনও শক্তি প্রয়োগ করা হয়নি। দিল্লি বা ইউপি এবং বিজেপি শাসিত অন্যান্য রাজ্যগুলিতে যেখানে যেখানে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে, পুলিশ সেখানে কারোর ওপর গুলি চালায়নি।

সত্য : এই হিংসা কেবলমাত্র বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেই হয়েছে যেগুলিতে প্রশাসন বিক্ষোভের নৃশংস দমনে নেমেছে। অ-বিজেপি শাসিত সমস্ত রাজ্যে যেখানে কোনও সহিংসতা ঘটেনি, সেখানে ব্যাপক এবং শান্তিপূর্ণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উত্তর প্রদেশে পুলিশের গুলিতে ২১ জনেরও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন এবং প্রতিদিন এই সংখ্যা বাড়ছে। পুলিশ গুলি চালায়নি বলে দাবি করা হাস্যকর এবং অবাস্তব। প্রতিবাদকারীরা কি নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা করেছিল? ইউপি-র অনেক জায়গায় পুলিশ মহিলাসহ সাধারণ নাগরিকের উপর অত্যাচার করেছে। ইউপি পুলিশের আক্রমণে যানবাহন, মোটরবাইক, দোকান ইত্যাদি সহ ব্যক্তিগত সম্পত্তি ধ্বংস করে ফেলার ভিডিও প্রমাণ রয়েছে, দিল্লি ও ইউপি'তে পুলিশ গুলি চালানোরও ভিডিও প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু মোদী সরকার দোষী পুলিশ কর্মীদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। দিল্লি পুলিশ অস্ত্র নিয়ে জামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছিল, লাইব্রেরিতে ঢুকে নিরস্ত্র ছাত্রদের বর্বরভাবে মারধর করেছে, ছাত্রাবাস এমনকি ল্যাবরেটরিতে গিয়ে পড়ুয়াদের টেনে বের করেছে। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিস্থিতি আরও খারাপ ছিল। স্টেন গ্রেনেড, টিয়ার গ্যাসের গোলা ব্যবহার এবং পড়ুয়াদের বর্বরভাবে মারধর করার ঘটনা ঘটায় বহু ছাত্র গুরুতর আহত হয়।

আসামে আন্দোলনের সময় পুলিশের গুলিতে পাঁচজন নিহত হয়েছে। কর্ণাটকে পুলিশের গুলিতে নিহত কমপক্ষে দু'জন।

বহু মানুষের ওপর মিথ্যা মামলা চাপানো হয়েছে। তাদের মধ্যে সিপিআই(এম) কর্মীরাও রয়েছেন। গুজরাটে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অরুণ মেহতাকে আহমেদাবাদে বাম দলগুলির শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদে অংশ নেওয়ার 'অপরাধে' গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টির অভিযোগ আনা হয়েছিল। বারাণসীতে, প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনী কেন্দ্রে সিপিআই(এম)-র প্রায় পুরো জেলা কমিটির নেতৃত্বকে ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৯-এ বাম দলগুলির ডাকে দেশব্যাপী প্রতিবাদ আহ্বানে যোগদানের পরে মিথ্যা অভিযোগে জেলে পাঠানো হয়েছে। বিজেপি সরকার শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের সাংবিধানিক অধিকার মেনে নিতে অস্বীকার করছে। এটি হলো সর্বাধিক স্বৈরাচারী সাম্প্রদায়িক শাসনের ক্ষমতার ঔদ্ধত্য প্রদর্শন।

উপসংহার

এটি কোনও হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে সীমায়িত বিষয় নয় যদিও সেভাবেই গোটা বিষয়টি চিত্রিত করার চেষ্টা চলছে। বরং এটি এমন একটি বিষয় যা ভারতের সংবিধানকে এবং তার ফলে ভারতের প্রতিটি নাগরিককে প্রভাবিত করে। সঙ্ঘ পরিবারকে ১৮৯৩ সালের শিকাগো ভাষণে স্বামী বিবেকানন্দের সেই কথাটি স্মরণ করানো এবং শেখানো দরকার : ''আমি সেই জাতির অন্তর্ভুক্ত বলে গর্ববোধ করি, যে জাতি পৃথিবীর সব ধর্মের ও সব জাতির নিপীড়িত ও শরণার্থী মানুষকে চিরকাল আশ্রয় দিয়ে এসেছে।''

সঙ্ঘ পরিবার, বিজেপি যার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, কখনই ভারতের সংবিধানকে গ্রহণ করেনি। ১৯৫০ সালে যখন ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর ভারতের সংসদে গৃহীত হওয়ার জন্য সংবিধান পেশ করেছিলেন, আরএসএস তার বিরোধিতা করেছিল। তারা সাভারকার এবং জিন্নাহ প্রচারিত দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রতি দায়বদ্ধ ছিল। তারা আরও দাবি করেছিল যে সংবিধানের ভিত্তি হওয়া উচিত মনুস্মৃতি। এই মতাদর্শ এবং দায়বদ্ধতা থেকেই তারা ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট এবং ঠিক এই বিবেচনা থেকেই ওরা সিএএ, এনআরসি এবং এনপিআর বাস্তবায়নকে নাগরিকত্বকে ধর্মের সাথে যুক্ত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে দেখছে।

অপরদিকে সমগ্র ভারতে সমাজের বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে এই বিক্ষোভ দেখিয়ে দিচ্ছে যে বিজেপি-আরএসএস সরকারের ত্রিমুখী হামলার বিরুদ্ধে ভারতের সংবিধানকে রক্ষার দায়বদ্ধতাকে দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধ। এখনও অবধি ১৩জন মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে তারা এনআরসি বাস্তবায়ন করবেন না। কেরালার এলডিএফ সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে যে এনপিআর বাস্তবায়ন কেরালায় স্থগিত থাকবে। এনআরসি-র বিরোধিতা করা প্রতিটি সরকারের এনপিআর আপডেট এবং প্রক্রিয়াকরণ শুরু করার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তও প্রত্যাখ্যান করা জরুরি। এনপিআর/এনআরসি প্রক্রিয়া এমন একটা সময়ে হাতে নেওয়া হচ্ছে যখন দেশের বেশিরভাগ মানুষের কাছেই আধার পরিচয়পত্র পৌঁছেছে। তাদের কাছে ভারতের নির্বাচন কমিশন জারি করা ইলেক্টরস ফটো আইডেন্টিটি কার্ডও রয়েছে। সুতরাং আর একটি নাগরিকত্বের রেজিস্টার এবং পরিচয়পত্র নেহাতই অতিরিক্ত। তাছাড়া, এটা একটা অতিশয় ব্যয়বহুল কাণ্ড হবে। আসামে এনআরসি প্রক্রিয়ার জন্যে ইতিমধ্যে কোষাগার থেকে ১২২০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আসামের জনসংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার ৩%-রও কম। এটাকে ভিত্তি ধরে হিসাব করলে, মোট এনআরসি প্রক্রিয়াতে ৫০,০০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় হবে।

মোদী সরকারের সৌজন্যে ভারত আজ এক মন্দার মুখোমুখি – যার গুরুভার বহন করছে সাধারণ মানুষ, আর বড় কর্পোরেট এবং অতি ধনীদের বাড়বাড়ন্ত ঘটছে। আমাদের

সংবিধান রক্ষার সংগ্রাম তাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচারের জন্য আমাদের সংগ্রামের সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। একই সঙ্গে আমরা এও জানি যে সরকারের এই প্রয়াসসমূহ আমাদের দেশের যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে তার চূড়ান্ত ব্যর্থতা ও সুস্থ মানবিক জীবনজীবিকা প্রদানে সম্পূর্ণ অপদার্থতা থেকে মানুষের মনোযোগ সরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টার সাথে গভীরভাবে জড়িত।

আমরা আশা রাখি যে এই তথ্যপুস্তিকা বিজেপি এবং তার সঙ্ঘ পরিবারের সহযোগীদের ছড়িয়ে দেওয়া কয়েকটি মিথ্যা ও তথ্যবিকৃতির জবাব দেবে এবং সংবিধান রক্ষার সংগ্রাম এবং সিএএ/এনআরসি/এনপিআর-র বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে শক্তিশালী করবে।

(কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত)

এনআরসি নিয়ে তৃণমূলের দ্বিচারিতা প্রসঙ্গে

এরাজ্যে এক জটিল পরিস্থিতি। তৃণমূল সরকার এনআরসি'র ডিটেনশন ক্যাম্পের জন্য জমি দেখছে, জমি হস্তান্তর করতে চাইছে, কেন্দ্রের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে এবং ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরির কাজ এগিয়ে নিয়ে গেছে। অথচ হাওয়া বুঝে শেষ মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মুখে সিএএ-এনআরসি-র বিরোধিতায় ব্যয়বহুল প্রচার করে যাচ্ছেন।

সবাই যখন এনআরসি নিয়ে উদ্বিগ্ন, ঠিক তখন, গত ১৮ সেপ্টেম্বর আড়াই বছর পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। আধঘন্টা বৈঠকের পর বাইরে এলে মুখ্যমন্ত্রীকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেন, দিদি, এনআরসি নিয়ে কোনও কথা হয়েছে? জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "না এনআরসি নিয়ে কোনও কথা হয়নি। কতগুলো বিষয় একসঙ্গে বলব? আর, এনআরসি তো শুধু অসমের বিষয়। বাংলায় তো এখন কিছু হচ্ছে না! এখানে রাজনৈতিক কোনও ব্যাপারে আলোচনা হয়নি।"

এনপিআর যে এনআরসি-র প্রথম ধাপ একথা বহু আগে থেকে বামপন্থী ও বিরোধীদের পক্ষ থেকে বহু বলা হলেও দিল্লি থেকে ফিরে এসেই সংবাদপত্রে, বৈদ্যুতিন মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন, ''এনপিআর নিয়ে উদ্বেগের কিছু নেই। এটা এনআরসি'র অংশ নয়, এটা জনগণনার প্রক্রিয়ার অংশ।'' এমনকি, এনপিআর প্রক্রিয়ার জন্য রাজ্য সরকারি কর্মীদের প্রশাসনিক প্রশিক্ষণের কাজও শুরু করে দেন তিনি। বামপন্থীরা যখন এনআরসি বিরোধিতায় ডিটেনশন ক্যাম্প ভাঙার কথা বলছেন, তখন তৃণমূল সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হলো, 'চিন্তার কিছু নেই। এরাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় যে দু'টি ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরি হচ্ছে সেগুলিতে কেবলমাত্র বিদেশী বন্দিদের রাখা হবে, ভাষা ও সংস্কৃতির ফারাকের কারণে তাদের অন্য বন্দিদের সঙ্গে রাখায় সমস্যা হচ্ছে বলে। এর সঙ্গে এনআরসি'র কোনও সম্পর্ক নেই।'

আসামের এনআরসি কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে ১ লক্ষ ১১ হাজার ৫০০ জন আবেদনকারী সম্পর্কে তথ্য ও প্রামাণ্য কাগজপত্র চেয়েছিল। তৃণমূল সরকার মাত্র ৬ হাজার জনের রিপোর্ট পাঠিয়েছিল। এর জন্য যাদের নাম আসাম এনআরসি-তে স্থান পায়নি, তার দায়ভার তৃণমূল সরকারেরও আছে।

পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সিএএ/এনআরসি বিরোধিতায় মমতা ব্যানার্জির তৃণমূল কংগ্রেস অবশেষে রাস্তায় নেমেছে। সিএএ/এনআরসি/এনপিআর নিয়ে আইন বাতিল, এনপিআর-র মাধ্যমে এনআরসি চালু করার অভিসন্ধিমূলক উদ্যোগ প্রত্যাহার করে নেবার জন্য বিধানসভায় প্রস্তাব গ্রহণের উদ্যোগ নিক রাজ্যের শাসকদল। ধর্মীয় আখ্যান বাদ দিয়ে নির্যাতিত সকল শরণার্থীদের ভারতের নাগরিকত্ব দান এবং সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ

গণতান্ত্রিক কাঠামোর রক্ষার দাবি বামপন্থীরা তিন দশক ধরে করে আসছে। বিলম্বে হলেও সদিচ্ছা থাকলে বিজেপি'র হাত ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেস ও তার সরকার দ্ব্যর্থহীনভাবে এ দাবিতে এগিয়ে আসুক, বন্ধ করুক সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতা, মেরুকরণের ভয়ঙ্কর রাজনীতি, সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের অভিযান। কিন্তু পারবেন কি তিনি?

চোখ বুজে ভরসা করে থাকবেন এই মুখ্যমন্ত্রীর ওপর? তাঁর 'ক্যা, ক্যা' ঢঙের প্রতিবাদের ওপর?

গোটা দেশের সঙ্গে এরাজ্যেও প্রতিবাদ যখন তুঙ্গে উঠেছে, একমাত্র তখনই মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন এরাজ্যে এনপিআর'র কাজ স্থগিত থাকবে। মনে রাখবেন, এনপিআর-র কাজ কিন্তু এরাজ্যে এখনও বাতিল হয়নি। বামপন্থীরা যখন বনগাঁ এবং রাজারহাটে গিয়ে ঘোষণা করে এলেন যে ডিটেনশন ক্যাম্পের জন্য জমি দেওয়া চলবে না, জমি দিলে সেখানে লালঝান্ডা পুঁতে দেওয়া হবে, একটা ইটও গাঁথতে দেওয়া হবে না, তখন মুখ্যমন্ত্রী পিছু হটলেন। হিডকো'কে দিয়ে একটি রহস্যজনক বিজ্ঞাপন দেওয়ালেন যাতে লেখা আছে যে হিডকো'র থেকে কোনও জমি ডিটেনশন ক্যাম্পের জন্য দেওয়া হচ্ছে না। হিডকোর আওতার বাইরে রাজারহাটে জমি দেওয়া হচ্ছে কিনা এবং রাজ্য সরকারের কোনও দপ্তরের কোনও জমি ডিটেনশন ক্যাম্পের জন্য দেওয়া হচ্ছে না, সেই ঘোষণা কিন্তু আজ পর্যন্ত এরকম লিখিতভাবে করা হয়নি।

গত ৬সেপ্টেম্বর, ২০১৯ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এনআরসি বিরোধী প্রস্তাব নেওয়া হয়। বিজেপি ছাড়া সব দলই তাকে সমর্থন করে। কিন্তু তখন প্রস্তাবে এনপিআর'র বিরুদ্ধে একটি শব্দও ঢোকানো হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এরাজ্যে এনআরসি করতে না দেওয়ার কথা বললেও এনপিআর প্রসঙ্গে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। বামফ্রন্ট বিধায়ক আলি ইমরান রামজ কিন্তু সেদিনই এনপিআর নিয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, কেন রাজ্য সরকার এনপিআর বাতিলের ঘোষণা করছে না? এনপিআর হলে তো আর এনআরসি রোখা যাবে না!

প্রায় মোদীর মতোই ডিগবাজি খেয়ে গত ২৭ডিসেম্বর নৈহাটিতে মমতা ব্যানার্জি বলেছেন, ''আমি এনপিআর'কে প্রথমে ভেবেছিলাম সেনসাস। পরে দেখলাম আইনই বদলে দিয়েছে। তাই কেন করব?'' আইন বদলালো কে? গোড়া খুঁজতে গেলেও দ্বিচারিতা এড়াতে পারবেন না মমতা ব্যানার্জি। ২০০৩ সালে নাগরিকত্ব আইনের সংশোধন করে এনডিএ সরকার। নাগরিকত্বের আইনের সংশোধন করে '১৪এ' ধারা সংযুক্ত করা হয়েছিল সেই সময়। অটলবিহারী বাজপেয়ীর সেই সরকারের মন্ত্রী ছিলেন মমতা ব্যানার্জি। ২০০৩সালে মন্ত্রীসভায় প্রবেশ করে প্রথমে দপ্তরবিহীন মন্ত্রী ছিলেন। পরবর্তীকালে লোকসভা ভোটের আগে পর্যন্ত কয়লা মন্ত্রক সামলেছেন মমতা ব্যানার্জি। সেই সরকারই নাগরিকত্ব আইনে '১৪এ' ধারা যুক্ত করে বলে দেয়, কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে বাধ্যতামূলকভাবে প্রত্যেক ভারতবাসীর নাম নথিভুক্ত ও একইসঙ্গে প্রতিটি নাগরিকের জন্য 'ন্যাশনাল আইডেনটিটি কার্ড' ইস্যু করতে পারে। এরসঙ্গেই ২০০৩ সালের সংশোধিত নাগরিক আইনে বলা হয়েছিল, ন্যাশনাল রেজিস্ট্রার অথরিটি তৈরি করে কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মনে করলে

প্রত্যেক দেশবাসীর জন্য নাগরিকপঞ্জি তৈরি করতে পারে। অর্থাৎ এনআরসি এবং এনপিআর দু'টোই আইনগতভাবে ভিত্তি পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সমর্থনে বাজপেয়ী সরকারের হাত ধরে। মমতা ব্যানার্জি অবশ্য এখনও 'বাজপেয়ী ভালো, মোদী খারাপ' বলে থাকেন। কিন্তু বাজপেয়ী সরকারের সেই আইনের দায় তিনি এখন লুকোবেন কী করে?

২০০৪ সালে বামপন্থীদের সমর্থনে ইউপিএ সরকার চলে আসায় এনআরসি, এনপিআর প্রসঙ্গ আলমারিতে তালাবন্দি হয়ে গেছিল। বিশেষত: আধার কার্ড চালু হবার পর। কিন্তু আরএসএস তাদের দীর্ঘদিনের পরিকল্পনাকে ধাপে ধাপে রূপায়ণ করার দিকে এগিয়েছে। বাজপেয়ী সরকারের সময় যার শুরু মোদী সরকারের আমলে সেটাকেই আরেক ধাপ এগিয়ে চূড়ান্ত ছোবল মারতে উদ্যত হয়েছে। এনআরসি, এনপিআর, সিএবি হলো রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হিন্দুত্ববাদী রাষ্ট্র গঠনের কর্মসূচির অংশ। তাদের বিভাজনের রাজনীতির মোকাবিলা করতে হলে দরকার আদর্শভিত্তিক লড়াই। এরাজ্যে বিজেপি'র মদতেই কংগ্রেস ভেঙে তৈরি মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল দলের রাজনীতির কোনও নীতি আদর্শ নেই।

জন্মলগ্ন থেকে তৃণমূল বিজেপি'র হাত ধরে বড় হয়েছে। বিজেপি'র সঙ্গে মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রের সরকারে ছিলেন, মন্ত্রীও হয়েছেন বারবার। বরাবরই তিনি আরএসএস-র এজেন্ডাকে এরাজ্যে তুলে ধরেছেন। ২০০৩ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর আরএসএস সম্পর্কে নিজের অন্তরের গভীরতম অনুরাগ প্রকাশ করেছিলেন মমতা ব্যানার্জি। আরএসএস-র একটি জাতীয় পর্যায়ের একটি অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে তিনি বলেছিলেন- ''আপনারাই সত্যিকারের দেশপ্রেমিক! আমি জানি আপনারা দেশকে ভালোবাসেন...''। তাঁর আবেদন ছিল, ''যদি আপনারা (আর এস এস) আমাকে ১ শতাংশ সাহায্য করেন, আমরা কমিউনিস্টদের সরাতে পারবো।'' মমতা ব্যানার্জি সেদিন আর এস এস-র নেতাদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন,''কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আপনাদের লড়াইয়ে আমরা সঙ্গে আছি।'' সেদিন কমিউনিস্ট-বিরোধী একটি বই প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত আর এস এস-র ওই সভায় হাজির ছিলেন এইচ ভি শেষাদ্রি, মোহন ভাগবতের মতো কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা নেতারা। তৃণমূল নেত্রীর সেদিনের বক্তব্যে উচ্ছ্বসিত বিজেপি-র রাজ্যসভার সাংসদ বলবীর পুঞ্জ ওই সভাতেই বলেছিলেন,''আমাদের প্রিয় মমতাদিদি সাক্ষাৎ দুর্গা।'' তিনি সঙ্ঘকে 'দেশপ্রেমিক' মনে করেন। তিনি সঙ্ঘের পুরানো সমর্থক। তিনি আরএসএস-র 'দুর্গা'।

সংসদে 'অনুপ্রবেশ' ইস্যুতে সঙ্ঘ পরিবারের বক্তব্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ হিসাবে তুলে ধরেছেন যিনি, তাঁর নাম মমতা ব্যানার্জিই। দিনটি ছিল ২০০৫-র ৪ঠা আগস্ট। লোকসভায় উপাধ্যক্ষের মুখের উপরে কাগজের তাড়া ছুঁড়ে দিয়ে অভব্যতার এক নজির সৃষ্টি করেছিলেন আজকের মুখ্যমন্ত্রী। সারা দেশ হতবাক হয়ে গেছিল তাঁর এই কাণ্ডে। সেদিন তিনি এমন করেছিলেন কেন? কারণ, সেদিন তিনি সংসদে 'অনুপ্রবেশ সমস্যা' নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন। অনুমতি মেলেনি। তাই ওই অভব্যতা। অর্থাৎ, রাজ্যে যখন শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলনের অবস্থানের কারণে সাম্প্রদায়িক শক্তি পা রাখার সামান্য জায়গাও পাচ্ছে না, তখন 'পশ্চিমবঙ্গের অনুপ্রবেশ' নিয়ে সংসদে বলে সঙ্ঘ পরিবারের

কাছে বার্তা দিয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি – 'আমি তোমাদেরই লোক।' তিনি সংসদে ওই ন্যক্কারজনক কাণ্ড করেছিলেন, কারণ সংসদে, সারা দেশের সামনে সিপিআই(এম)'কে 'মুসলিম তোষণকারী' প্রমাণ করার দায়িত্ব তাঁকে সঙ্ঘ দিয়েছিল।

মমতা ব্যানার্জি ও তাঁর দল শুধু আদর্শহীনতায় ভুগছেন তাই নয়, দেউলিয়াপনা এবং চরম সুবিধাবাদেও নিমজ্জিত। তৃণমূল সরকারের আমলেই এরাজ্যে আরএসএস-র শাখা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বামফ্রন্ট সরকারের সময়ে যা কল্পনাও করা যায়নি, আজ বিজেপি-আরএসএস-র বাড়বাড়ন্ত হয়েছে তৃণমূল সরকারের সৌজন্যেই। মমতা ব্যানার্জির সাম্প্রদায়িক মেরুকরণসহ যাবতীয় সুবিধাবাদী নীতির জন্যই এরাজ্যে ধর্মীয় বিভাজন বৃদ্ধি পেয়েছে। সংসদে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল পেশের মত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তাঁর বিরোধিতায় পরিকল্পিতভাবে নিজের দলের পুরো শক্তিকে হাজির করাননি তিনি। লোকসভাতে তৃণমূল কংগ্রেসের ৮জন, রাজ্যসভাতে ১জন এই সাংসদ এই গুরুত্বপূর্ণ বিল নিয়ে ভোটাভুটির সময় অনুপস্থিত ছিলেন। রাজ্যসভায় তৃণমূল কোন্‌দিকে ভোট দিয়েছে প্রশ্ন উঠেছে। এটা বিজেপি, সঙ্ঘের সঙ্গে তৃণমূলের আপসকামিতারই নিদর্শন। ২০১৬সালে যখন এই বিল প্রথম পেশ হয়, তখন জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটিতে তৃণমূলের তিনজন সদস্য ছিলেন। এবিষয়ে কতটা সিরিয়াস ছিলেন এবং কটি সভায় উপস্থিত ছিলেন, তা যে কেউই সংসদের ওয়েবসাইটে গেলেই দেখতে পাবেন। এনপিআর এরাজ্যে স্থগিত রাখার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করলেও তৃণমূল পরিচালিত ইসলামপুর পৌরসভা যে এই কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে, তা প্রকাশ্যে এসেছে। গোপনে অন্যত্র এই কর্মসূচি জারি রেখেছে তৃণমূল সরকার দিল্লির মোদী সরকারকে বার্তা দেওয়ার জন্যই। সারদা-নারদা কেলেঙ্কারি, রাজীব কুমার কান্ডে কেন্দ্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট বোঝাপড়া ও আপসের চিত্র এখন মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়ে গেছে।

এরাজ্যে মমতা ব্যানার্জি আসলে সঙ্ঘের রাজনীতির পরিপূরক হয়ে উঠেছেন। পশ্চিমবঙ্গে স্বৈরাচারী তৃণমূল সরকার গত আট বছরে গণতান্ত্রিক কাঠামোকে প্রায় ধ্বংস করেছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে নষ্ট করেছে। মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসকে ছোবল মারতে চেয়েছে তৃণমূলই। ভরসা কাকে করছেন? মোদীকে? নাকি মমতা ব্যানার্জিকে? দুটোই ভয়ঙ্করতার এপিঠ ওপিঠ।

জনগণের জীবনমান, আর্থিক স্বার্থ, যুবকদের কর্মসংস্থান, গোটা রাজ্যকে তোলাবাজি ও দুর্নীতিতে ডুবিয়ে দেওয়া, ভোটলুট-গণতন্ত্রহরণ বিজেপি-আরএসএস'র সঙ্গে হাত মিলিয়ে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বিভাজন বাড়িয়ে তোলা ইত্যাদি তৃণমূলী শাসনের কয়েকটি কীর্তি। সিএএ-এনআরসি-এনপিআর নিয়ে তৃণমূলের দ্বিচারিতা মাত্রাহীন। এর বিরুদ্ধে ধারাবাহিক ঐক্যবদ্ধ ও আপসহীন সংগ্রামই পথ। একমাত্র বামপন্থীরাই পারে বিভিন্ন মঞ্চ, সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করে রাজ্যকে, দেশকে রক্ষা করতে। ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়াই এখন একমাত্র পথ।

(রাজ্য কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত)

প্রচ্ছদ: মনীষ দেব

সিপিআই(এম) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য
কমিটির পক্ষে সুখেন্দু পানিগ্রাহী কর্তৃক
প্রকাশিত ও প্রচারিত
এবং এস পি কমিউনিকেশনস প্রা. লি.
কলকাতা-৯ হইতে মুদ্রিত।

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০২০

মূল্য : ১০ টাকা